গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ৩ | সংখ্যা : ৫ | জানুয়ারি ২০১২

আবুল ফজল

"আমি বাংলা লিখতে শুরু করি ছাত্রাবস্থায় ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ থেকেই কিন্তু অত্যন্ত গোপনে। যাতে জানাজানি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে আমি কসুর করিনি। তবুও একবার অঘটন ঘটে গেল। তখন কি একটা লেখা আমার 'সওগাতে'-এ বের হওয়ার পর বাবার পরিচিত স্থানীয় হাইস্কুলের জনৈক শিক্ষক লেখাটি পড়ে খুব খুশি হন, খুশির চোটে, হয়তো শুনে বাবাও খুশি হবেন মনে করে, তিনি খবরটি বাবাকেও জানান। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত। শুনে বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আরবি-ফার্সি বিদ্যায় আমার অনাগ্রহ ও অনগ্রসরতায় বাবা এর মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং এ কারণে আমার উপর ছিলেন অত্যন্ত নাখোশ। বাপ-দাদার পদাংক অনুসরণ করে আমিও ভালো আলেম হই গোড়া থেকে এ ছিল তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্প।

বাবা তখন চট্টগ্রাম জুমা মসজিদের ইমাম। সারা শহরে ইমাম সাহেব নামে পরিচিত। আপামর জনসাধারণের সামনে সাধুতা ও পরহেজগারির এক উজ্জ্বল প্রতীক। এহেন ইমাম সাহেবের ছেলে বাংলা মাসিকে বাংলা লেখা ছাপাবে এ শুধু অকল্পনীয় নয় বাবার কাছে প্রায় ধর্মদ্রোহীতারই কাছাকাছি। উক্ত ভদ্রলোক আমার লেখা সম্বন্ধে খবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর দুর্ভাগ্যবশত কি একটা জরুরি ব্যাপারে আমাকে বাবার সামনে যেতে হল। আমাকে দেখেই আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন তিনি। দেখলাম তাঁর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ভিতরের উত্তেজনায় চোখমুখ প্রদীপ্ত। হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে ফেটে পড়লেন

: তুমি নাকি মাসিকপত্রে কি লিখেছ?

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে, আমি প্রায় হতভম্ব। তাঁর রক্তচক্ষু তখনো আমার মুখের উপর।

অগত্যা কাঁচুমাচু মুখে আমতা আমতা করলাম: না তো।

: এইমাত্র কবির সাহেব বলে গেলেন 'সওগাত' নাকি এক মাসিক কাগজে তোমার কি এক বাংলা লেখা ছাপা হয়েছে?

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মুখ করে বল্লাম: আমার লেখা? কাগজে ছাপা হয়েছে! মাস্টার সাহেব হয়তো ভুল করেছেন। এক এক কথার পর এক একবার ঢোক গিল্লাম।

: তিনিতো পরিষ্কার বলে গেলেন আপনার ছেলে আবুল ফজলের লেখা। এবার তাঁর গলায় রাগের সঙ্গে বিস্ময়েরও যোগ ঘটল। হঠাৎ আমার বুদ্ধির গোড়ায় যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মুহূর্তে দেখতে পেলাম পলায়নের ফাঁক। ফিরে পেলাম আত্মবিশ্বাস আর মনের জোর। কিছুটা জোর গলায় বল্লাম: আমার নামতো মোহাম্মদ আবুল ফজল। ও অন্য কোন আবুল ফজল হতে পারে।

উত্তরটা এতই যুক্তিসঙ্গত যে বাবার কাছেও তা অবিশ্বাস্য বা অসমীচীন মনে হলো না।

রাগ পড়ে যাওয়ার পর বাবা সেদিন আমাকে শুধু এ উপদেশটুকু দিয়েই রেহাই দিয়েছিলেন: লিখতেই যদি চাও, আরবি-ফারসিতে না পারো, উর্দুতে লিখতে চেষ্টা কর"। (রেখাচিত্র-আবুল ফজল, পৃষ্ঠা-১৩)

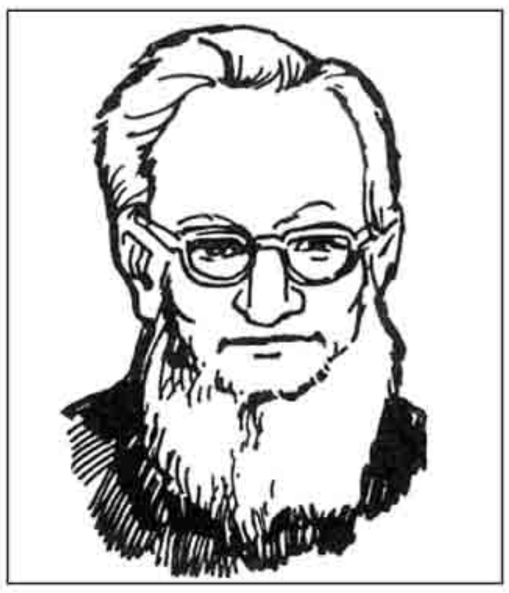

উপরের কথাগুলো বলেছেন বরেণ্য সাহিত্যিক আবুল ফজল। লেখা সম্পর্কে বাবার দেয়া উপদেশ তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ বাবার উপদেশ মতো উর্দূতে লিখেননি তিনি। লিখেছেন বাংলায়। আর সেকারণে সেই বয়স থেকেই বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিরন্তর লিখে গেছেন তিনি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশের পূর্বেই বাবা মারা যান। ফলে সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত এদেশের অন্যতম সাহিত্যিক আবুল ফজল যে তাঁরই ছেলে মোহাম্মদ আবুল ফজল একথা জানার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর।

১৯০৩ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় বত্রিশ মাইল দক্ষিণে এক অখ্যাত অজপাড়াগাঁ কেঁওচিয়ায় আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামে থাকার কারণে আবুল ফজলের ছেলেবেলা কিছুটা বেপরোয়াভাবেই কেটেছে। বাবা শহরে থাকতেন। মার সাথে তাঁরা তিন ভাই-বোন গ্রামে থাকতেন। তিনি একমাত্র ছেলে হওয়ায় তাঁর মুরুব্বি ছিলেন তিনি নিজেই। শাসন করার কেউ না থাকায় সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের ঘরটা ছিল পুকুর পাড়ে। গরমের দিনে ঐ পুকুরেই সারাদিন পড়ে থাকতেন।

তাঁর বাবা ছিলেন আলেম। শুধু তিনি নন, তাঁর বাবা অর্থাৎ আবুল ফজলের দাদাও ছিলেন আলেম। তাঁরা ইংরেজি বাংলার ধার ধারতেন না, আরবি-ফারসি-উর্দুর চর্চা করতেন। এই আবহাওয়া ও পরিবেশ সে যুগের অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে ছিল।

বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ আবুল ফজল। কিন্তু আবুল ফজল নামেই তিনি লেখালেখি করেছেন।

ঘরে একজন মিয়াজি রেখে প্রথমে তাঁকে আমপারা পড়ানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মিয়াজিকে তিনি কখনও আমল দিতেন না। মিয়াজি এলে তিনি বন্ধুদের সাথে খেলতে যেতেন। এরপর তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। এটিই ছিল তাঁর প্রথম ও আদি স্কুল। এখানে অল্প কিছুদিন পড়ার পর বাবার সাথে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন।

এখানে আসার পর প্রথমে তাঁর বাবার বাসার কাছাকাছি নন্দন কাননে এক হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয়। মাদ্রাসা সেশন শুরু হতে দেরি ছিল বলে সাময়িকভাবে তাঁকে ঐ স্কুলে ভর্তি করা হয়। পরে ১৯১৩/১৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়। সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মাদ্রাসাটি অবস্থিত ছিল।

বাবার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না বলে তাঁকে বেশিদিন বাবার সঙ্গে থাকতে হয়নি। পঞ্চম শ্রেণী থেকেই তিনি জায়গীর থাকা শুরু করেন। জায়গীর মানে থাকা-খাওয়া ফ্রি বিনিময়ে গৃহকর্তার দু'একটি বংশধরকে আমপারা বা অ আ পড়াতে হতো। আর হয়তো মাঝে মাঝে হাঁস-মুরগি জবাই করে দিতে হতো। সেসময় জায়গীর প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর তাঁর চট্টগ্রামে ছাত্র জীবনেরও ইতি ঘটে। ম্যাট্রিক মানে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা। তখন চট্টগ্রামে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস খোলা হয়নি। তাই হাই মাদ্রাসা পাশ করার পর চট্টগ্রামের ছাত্রদের ঢাকায় যেতে হত। ১৯২৫ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে বি.এ. পাস করেন। এরপর বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষক হওয়ার সংকল্প করলেন তিনি। পাকা শিক্ষক হওয়ার জন্য বি.টি. ডিগ্রি অপরিহার্য। তাই ১৯২৯ সালে বি.টি. পড়ার জন্য ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯২৯ সালেই তাঁর বাবা মারা গেলেন। বি.টি. পাস করার পর ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম ফিরে এলেন।

১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম শহরের কাজী বাড়ির মেয়ে নূরজাহান বেগমের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আবুল ফজলের বিয়ে হয়। কিন্তু নূরজাহান বেগম যখন সাত-আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা তখন হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। এরপর আবুল ফজল দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং এই স্ত্রীও এক ছেলে রেখে মারা যান। এরপর তিনি তৃতীয়বার বিয়ে করেন এবং এই ঘরে দুই ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই ঘরের এক ছেলে দেড় বছর বয়সে মারা যায়।

১৯৩৩ সালে আবুল ফজল খুলনা জেলা স্কুলে দ্বিতীয় পন্ডিতের পদে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে খুলনা ছেড়ে এসে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে সহকারী ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে যোগ দেন চট্টগ্রাম কলেজে। এই কলেজের কলেজ গভর্নিং বডির নির্বাচনে তিনি দাঁড়ান এবং জয়ী হন। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে তাঁর মা মারা যান। দীর্ঘ সময় এই কলেজে চাকরি করার পর ১৯৫৯ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় থেকেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। আবুল ফজলের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হলো- 'রহস্যময়ী প্রকৃতি', 'প্রেম ও মৃত্যু', 'বিবর্তন', 'চোর', 'বিংশ শতাব্দী' প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো- 'রাঙ্গাপ্রভাত', 'চৌচির', 'জীবন পথের যাত্রী', 'মাটির পৃথিবী', 'বিচিত্র কথা', 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন' প্রভৃতি।

তাঁর রচিত 'চৌচির', 'মাটির পৃথিবী' আর 'বিচিত্র কথা' নামের তিনটি বই ১৯৪০ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে, শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তখন নিজের হাতে এক দীর্ঘপত্র তাঁকে লিখেছিলেন।

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'রাঙ্গা প্রভাত' বইটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পাঠ্য হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কলেজে যাঁরা বইটি পড়াতেন সেসব অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ কেউ বইটির প্রশংসা করে তাঁকে চিঠি লিখেছেন।

১৯৬৩ সালের ৭ ডিসেম্বর 'আজাদ'-এ জনৈক লেখক জাতীয় আদর্শের বিরোধিতা : 'রাঙ্গাপ্রভাত' নামে এক প্রবন্ধ লিখে আবুল ফজলকে পাকিস্তান বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী বলে উল্লেখ করেন।

বইটি ছয় বছর ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ক্লাসে পড়ানো হয়। বইটিতে জাতীয় আদর্শ বা ধর্ম বিরোধী কোন কথা থাকলে তা ছাত্র ও অধ্যাপকদের চোখে পড়ত। 'আজাদ'-এ প্রকাশিত লেখাটির উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থের লেখকের কিছু ক্ষতিসাধন করে কিঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি লাভ। 'আজাদ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির কর্তৃকা (কাটিংস)কে বা কারা প্রদেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে রাউয়ালপিন্ডি প্রেসিডেন্ট দফতর পর্যন্ত সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন। ফলে পরের বছর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা থেকে বইটি বাদ পড়ে।

১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি সংকলন করেছিলেন 'সাহিত্য চয়নিকা' নামে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী দু'টি সাহিত্য বই। পাঠ্যবই হিসেবে ঐ দু'টি বই টেক্সট্ বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। তাঁর এ দু'টা সংকলন পাঠ্য বই হিসেবে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯৪৯ সালে তিনি কোরান শরীফ ভালো করে বুঝে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে 'কোরানের বাণী' নামক একটি বই প্রকাশ করেন। ডক্টর আবদুল্লা সোহরওয়ার্দীর 'Sayings of Muhammed' নামের বইটির সংকলিত ৫০০ হাদিস এবং অন্যান্য বই থেকে আরও ৫০০ হাদিস সংগ্রহ করে মোট ১০০০ হাদিস দিয়ে 'হাদিসের বাণী' নামে কোরানের বাণীর পরিপূরক হিসেবে আর একটি বই সংকলন করেন তিনি। ব্যাকরণের একটি বইও লিখেছেন তিনি।

লেখালেখির মাধ্যমে তিনি সবসময় সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছেন এবং করেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ। ফলে তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু পিছপা হননি তিনি, বরং সদর্পে চালিয়ে গেছেন তাঁর লেখালেখি।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে দেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার, সমকাল পুরস্কার এবং সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি।

১৯৮৩ সালের মে মাসে আবুল ফজল মৃত্যুবরণ করেন। ■

তথ্যসূত্র

রেখাচিত্র, লেখক-আবুল ফজল, প্রকাশক-সিকদার আবুল বাশার, প্রকাশনী-গতিধারা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

লেখক: মৌরী তানিয়া

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সারাজীবন তাঁদের সৃজনশীল চিন্তা, মনন ও মেধা দিয়ে শান্তি, মানবতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের লেখনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। অনেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির এইসব গুণী ব্যক্তিবৃন্দকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস 'গুণীজন' উদ্যোগে। 'গুণীজন' ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.gunijan.org.bd

'গুণীজন' www.gunijan.org.bd ওয়েব জার্নালে রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, নারী অধিকার অন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তাঁদের অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। এছাড়া আরো রয়েছে গুণীজনদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

'গুণীজন' কর্মসূচি মূলত স্বেচ্ছাশ্রম ও ব্যক্তিপর্যায়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত, কোন বিদেশী দাতাসংস্থার অর্থে পরিচালিত নয়। বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে ধীরে ধীরে আগ্রহ প্রকাশ করছে ও সহায়তা করছে। ফরাসী দূতাবাস এই ওয়েবসাইটের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

'গুণীজন' ওয়েবসাইটে এপর্যন্ত প্রায় ২৬৮ জন গুণীজনের জীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। জীবনীর সাথে সংযোজন করা হয়েছে দুর্লভ সব আলোকচিত্র, অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। কাজ চলছে আরো একহাজারেরও বেশী গুণীজনকে নিয়ে।

যেহেতু বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটছে ধীর গতিতে, তাই সিডি প্রকাশ ও স্কুল কর্মসূচিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে 'গুণীজন'-এর প্রসার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। গুণীজন প্রকাশিত সিডিগুলো হলো- 'মহিমা তব উদ্ভাসিত', 'মহিমা তব উদ্ভাসিত- মুক্তিযুদ্ধ খণ্ড-১', 'মহিমা তব উদ্ভাসিত- মুক্তিসংগ্রাম'। সিডিগুলো পাওয়া যাবে- বনানীর অরণ্য ক্রাফটস লিমিটেডে, আজিজ সুপার মার্কেটের সুরের মেলা, বিসিএল সিডি কর্ণার ও পাঠশালায়; ধানমণ্ডির বই বিচিত্রায়; আইডিবি ভবনের ইপসিতা কম্পিউটারস-এ এবং হুমায়ুন রোডের ডি.নেট কার্যালয়ে।

স্কুল কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকার বাইরে শিশু-কিশোরদের কাছে গুণীজনবৃন্দকে পরিচয় করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একাজে ডি.নেটের গ্রামীণ স্কুল ভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচি ও খেলাঘরের সাথে গুণীজন স্কুল কর্মসূচি যৌথভাবে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, বাংলা ভিশন, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, রহিম আফরোজ বাংলাদেশসহ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গুণীজন কর্মসূচিকে সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

আপানারা জেনে আনন্দিত হবেন যে 'গুণীজন' কর্মসূচিটি 'ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড ২০০৯'-এ বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে নমিনেশন প্রাপ্ত ৬০টিরও বেশী কর্মসূচির মধ্যে ই-কালচার এন্ড হেরিটেজ বিভাগে 'গুণীজন' কর্মসূচির স্থান ছিল ষষ্ঠতম। মনথন অ্যাওয়ার্ড, ২০০৮-এ গুণীজন কর্মসূচি নমিনেশন পেয়েছিল।

'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করার জন্য চার জন (আবুল ফজল, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্) গুণীজনের জীবনী নিয়ে 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

গুণীজনদের পরিচিতি দেশব্যাপী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হলো 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'গুণীজন' পত্রিকাটির যাত্রা শুভ হোক। নতুন প্রজন্মের মাঝে গুণীজনদের পরিচিতি ছড়িয়ে দেয়ার যে উদ্যোগ 'গুণীজন' কর্মসূচি নিয়েছে তা সফল হোক, এই প্রত্যাশা রইলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে। ■

আহসান হাবীব

ছোট্ট একটা কক্ষ। ভেতরে ভারি চশমাপড়া ছোটখাটো গোছের একজন লোক বসা। তাঁর চুলের রং ধবধবে সাদা। সিগারেট হাতে উদাস ভঙ্গিতে বসে আছেন। কখনো কখনো আয়েশ করে হাতের সিগারেটটি মুখে নিয়ে টেবিলের উপর কাগজগুলোতে নিবিষ্টমনে চোখ রাখছেন। কক্ষের ভেতরের ফ্যানের বাতাসে দরোজার পর্দাটা মাঝে মধ্যে নির্ধারিত স্থান থেকে সরে ভেতরটাকে স্পষ্ট করে তুলছে। পর্দার এই সামান্য ফাঁক ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে দেখা লোকটাকে মনে হয় ঋষি। টেবিলের উপরের কাগজের স্তুপ আর লোকটার ভাবগাম্ভীর্যসুলভ চেহারা ভেতরের পরিবেশটাকে অনেক বেশি গভীর করে তুলছে। কিন্তু কেউ কেউ এই গভীরতাকে পাশ কেটে পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছেন। তখন পরিবেশটা আর আগের মতো নীরব থাকে না। ক্রমাগত সাহিত্যের নানা আলোচনায় সরব হয়ে উঠে কক্ষটি। সামনে বসা ঋষিগোছের লোকটাকে সেই সময় আর বর্ষীয়ান কিংবা গম্ভীর প্রকৃতির মনে হয় না। চশমার পুরো লেন্সের কাঁচ মুছতে মুছতে সে গলা ছেড়ে ডাকে- "কালাম দুকাপ চা"। কালাম যথারীতি চা দিয়ে যায়। জমে উঠে তুমুল আড্ডা। ক্রমে দীর্ঘ হয় সে আড্ডা, আর সিগারেটের ধোয়ায় পুরো কক্ষটা সাদা হয়ে আসে।

এই দৃশ্যটা উনিশ শতকের সত্তর দশকের 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকা অফিসের চারতলার ছোট্ট একটি কক্ষের। ভারি চশমাপড়া সাদা চুলের ব্যক্তিটি হচ্ছেন স্বয়ং আহসান হাবীব। দেশভাগের পর তাঁর নেতৃত্বে এই কক্ষটি হয়ে উঠেছিল নতুন দেশের সাহিত্যের সূতিকাগার। নবীন প্রবীণ কবিদের পদচারণায় এই স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠতো প্রতিমূহুর্ত। সে সময় 'দৈনিক বাংলা' ও আহসান হাবীবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল। অসাধারণ ব্যাক্তিত্ববোধ, মনন, রুচি ও আচার আচরণে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন কিংবদন্তি সম্পাদক। সেদিন আহসান হাবীব অভিভাবকের মতো সাহিত্যের মূলধারায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখক মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। আজকের বাংলা কবিতার অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির প্রথম লেখা ছাপা হয়েছে আহসান হাবীবের হাত ধরে। তাঁর রুচি ও নিষ্ঠায় তখন 'দৈনিক বাংলার' সাহিত্য পাতা একটি আদর্শ সাহিত্য পাতার মর্যাদা অর্জন করেছিল। সম্পাদক হিসেবে ছিলেন একেবারেই নির্মোহ প্রকৃতির। সেই সময় দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা যখন অনুরোধ আর স্বজনপ্রীতিতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল ঠিক তখন তিনি স্থাপন করেছেন অনন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত। লেখা প্রকাশে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা কোনো সূত্রের চেয়ে নিজের রুচি ও বিচারবোধকে প্রাধান্য দিতেন তিনি। আর এই বিচারবোধ হলো গুণগতমান।

আহসান হাবীবের জন্ম ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পিরোজপুরের শংকরপাশা গ্রামে। পিতার নাম হামিজুদ্দীন হাওলাদার। মাতা জমিলা খাতুন। তাঁর পাঁচ ভাই চার বোন। অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল পিতা মাতার প্রথম সন্তান তিনি। বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন চার সন্তানের জনক। শ্বশুড় বাড়ি বগুড়া সদর থানার নামাজগড়। স্ত্রীর নাম খাতুন সুফিয়া। সন্তানদের মধ্যে বড় মেয়ে কেয়া চৌধুরী বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের উজ্জ্বল মুখ। দ্বিতীয় মেয়ে জোহরা নাসরিন গৃহিণী। ছেলে মঈনুল আহসান সাবের পেশায় সাংবাদিক। তিনি বাংলা মূলধারার কথা সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী। এছাড়া প্রকাশক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। ছোট ছেলে মঞ্জুরুল আহসান জাবেদ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে বাল্যকাল থেকেই লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। সেইসময় তাঁর বাড়িতে ছিল আধুনিক সাহিত্যের বইপত্র ও কিছু পুঁথি। যেমন আনোয়ারা, মনোয়ারা, মিলন মন্দির প্রভৃতি। এসব পড়তে পড়তে একসময় নিজেই কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করেন। তখন তাঁর বয়স ১২/১৩ বছর। স্কুলে পড়ার সময়ই ১৯৩৩ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর একটি প্রবন্ধ 'ধরম' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'মায়ের কবর পাড়ে কিশোর' পিরোজপুর গভর্নমেন্ট স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। পরবর্তী সময়ে ছাত্রাবস্থায় কলকাতার কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হলে নিজের সম্পর্কে আস্থা বেড়ে যায়। স্কুলে পড়াকালীন তিনি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুকে কবিতায় উপস্থাপিত করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ নিয়ে পিরোজপুর গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ১৯৩৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি চলে আসেন বরিশালে। ভর্তি হন সেখানকার বিখ্যাত বিএম কলেজে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কারণে কলেজের পড়াশোনার পাঠ শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত রাখতে হয় তাঁকে। বিএম কলেজে দেড় বছর পড়ার পর ১৯৩৬ সালের শেষার্ধে কাজের খোঁজে তিনি রাজধানী কলকাতায় পাড়ি জমান। এভাবেই কবি আহসান হাবীবের বরিশাল থেকে তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় পদার্পণ। ততদিনে অবশ্য 'দেশ', 'মোহাম্মদী', 'বিচিত্রা'র মতো নামি দামি পত্রপত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়ে গেছে। কলকাতা গিয়ে শুরু হয় আহসান হাবীবের সংগ্রামমুখর জীবনের পথচলা। সেখানে যেয়ে ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথমে চাকরি নেন ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদিত 'দৈনিক তকবীর' পত্রিকায়। বেতন মাত্র ১৭ টাকা। পরবর্তীতে তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কলকাতার 'বুলবুল' পত্রিকা ও ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় কাজ করেন। এছাড়া তিনি আকাশবাণীতে কলকাতা কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট পদে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

কবি হিসেবে আহসান হাবীবের যাত্রা শুরু হয় অবিভক্ত বাংলায়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল তখনো ছিল অখন্ড আকাশের মতো। ধূর্ত ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কূটচালে তখনও সীমান্তে আজকের মতো কাটাতাঁরের বেড়া কিংবা সীমানা চিহ্ন বসেনি। তবে রাজনীতির মঞ্চে তখন বিভাজনের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। ঠিক সে সময় যে কজন মুসলমান তরুণ আধুনিকতাকে আত্মস্থ করে বাংলা কবিতার গতিপথে ঢুকে পড়েছেন তার মধ্যে আহসান হাবীবের নাম অগ্রগণ্য। পরবর্তীকালে (১৯৪৭ সাল) ধূর্ত ইংরেজ শাসকদের কূটচালে বাংলা দ্বিখন্ডিত হলো। তিনি ফিরে এলেন ঢাকায়। ঢাকা হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন দেশের সাহিত্য নতুন স্রোতধারায় বিকশিত হবে এবং তা হয়েছিলও। কিন্তু সেই স্রোত আহসান হাবীবের অনুকূলে ছিল না। ইংরেজদের কূটচাল আর ধর্মের ঐক্যে বিভাজিত হওয়া রাষ্ট্রে সাহিত্যেও ধর্মীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হলো। কলকাতা থেকে সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন (পূর্ব পাকিস্তানে) হওয়ার পর মননের ক্ষেত্রে নেমে আসে নৈরাজ্যের ছায়া। তরুণরা কি নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করবে বার বার তারই পথ নির্দেশ করেছেন তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা। আর সেই নির্দেশিত পথ ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। তখন রাষ্ট্র যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের সেদিনের অবস্থা কবি গোলাম মুস্তাফার একটি লেখায় দারুণভাবে প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন- "তরুণ লেখকদের কাছে তাই আমার আহবান তারা সুস্থ হউন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করুন; সাধনা করলে পাকিস্তানের মাল মশলা দিয়ে তারা এমন সাহিত্য রচনা করতে পারবেন, যা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অনায়াসেই পরিবেশন করা যাবে। আল্লাহ নামে ড. আর্নল্ড যদি 'পার্লস অব দি ফেইথ' নামক সুন্দর কাব্য রচনা করতে পারেন, অ্যালান পো যদি কোরআন শরীফের সূরা আল আরাফ নিয়ে কাব্য লিখতে পারেন, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, ইউসুফ-জুলেখা, আলিফ-লায়লা নিয়ে যদি ইউরোপীয় লেখকেরা কাব্য রচনা করতে পারেন, হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়াম, ইকবাল এরা যদি নিজস্ব রূপ রং রস বজায় রেখে বিশ্বসাহিত্য রচনা করতে পারেন তবে আমরা কেন পারব না। যে বিশ্বে আমি নেই সে বিশ্বের মূল্য কী?"

ঠিক এরকম অসুস্থ সময়ে আহসান হাবীব নিজের বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়েননি। আপন বিশ্বাসে অটল থেকে নিজের লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন। উপমহাদেশের রাজনীতির টালমাটাল করা পাগলা হাওয়ার কবলে তিনি পতিত হননি। অথচ তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ সেদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন আর ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্ব-স্ব ধর্মের কবিরা সচেতনভাবে রাজনীতি ও ধর্ম উৎসারিত কবিতা লিখতে শুরু করেন। এমন পরিস্থিতিতে আহসান হাবীব সরাসরি রাজনীতি কিংবা ধর্ম উৎসারিত একটি লাইনও রচনা করেননি। দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়েও তাঁর এই নির্বিকার মনোভাব অব্যাহত ছিল। সাহিত্য, রাজনীতি, দলবাজিতা কিংবা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না। সচেতন ভাবেই তিনি এ ধরনের প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে রেখেছেন মুক্ত। অন্যদিকে নিজের কবিতাকেও রেখেছেন নিরাপদ দূরত্বে। তাঁর এমন নির্মোহতা প্রচন্ড প্রাণ শক্তির পরিচয় বহন করে।

আত্মপ্রচারণামুখর হৈচৈয়ের সময়ে আহসান হাবীব অন্তর্গত জগতেই নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন। কলেজ জীবনে পড়ালেখায় ইস্তফা দিয়ে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্যই কলকাতায় যাননি তিনি। অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে ছিল সাহিত্যের প্রতি আজন্ম ভালবাসা। সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন কাব্যচর্চা আর সাহিত্য সাধনায়। গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, এমনকি গানও লিখেছেন। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় বেশ কিছু উৎকৃষ্ট দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছিল। আহসান হাবীবের- 'দুর্গম এ যাত্রাপথে কোনো বাধা মানব না' এ গানটি সে সময়েরই লেখা এবং তাঁর লেখা এই গানটি বেশ সুনাম কেড়েছিল।

তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস, ছড়াগান ও অনুবাদকার্য ছড়িয়ে থাকলেও আহসান হাবীব মূলত কবি। সময়ের প্রয়োজনে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলোয় আগ্রহী হয়ে উঠলেও কবিতায়ই ছিল তার মূল আগ্রহের জায়গা। শৈশবে, কৈশোরে ও পারিবারিক অনুকূল আবহে সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালবাসা ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই ভালবাসা ছিল মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রাত্রি শেষে' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে কমরেড পাবলিশার্স থেকে। প্রকাশক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) শুরুর দিকে অস্থির সময়ে তিনি লেখালেখি করেছেন একাগ্রতার সঙ্গে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বারবার স্থান বদল করলেও শেকড়ের প্রতি তিনি ছিলেন আজন্ম দায়বদ্ধ। আর তাই সাহিত্যের বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন দেশ, মাটি, মানুষ, নিসর্গ ও প্রেম। শৈশবে বেড়ে ওঠা জন্মগ্রাম শংকরপাশা আর পারিবারিক অর্থনৈতিক দূরাবস্থার প্রভাব তাঁর সাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে দেখেছেন তিনি। নিরীহ মানুষের জীবন, বৈষম্য, বন্টন, পরাধীনতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের দায় প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে তাঁর 'রাত্রি শেষে' নামক প্রথম গ্রন্থে (কবিতা)। পরবর্তী সময়ে 'ছায়া হরিণ', 'সারা দুপুর', আশায় বসতি, 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো', 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' এবং 'প্রেমের কবিতা'সহ বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি তাঁর কবিতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এসব গ্রন্থে ঐতিহ্য, চেতনা, দেশপ্রেম ও মধ্যবিত্ত সুলভ আশাবাদের বিশ্বাস রয়েছে। বিষয়গত বৈশিষ্ট্য ছাড়া কবিতায় শব্দের নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষণীয়। নদী মাতৃক গ্রাম বাংলার নিসর্গ সৌন্দর্যকে তিনি ওই শব্দের ব্যবহারে চিত্রময়তা দিয়েছেন। প্রকৃতি ও মানবজীবন ঘিরে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা চমৎকারভাবে তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

শিশুতোষ লেখায়ও আহসান হাবীবের সাবলীল বিচরণ ছিল। সত্তর দশকে শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শিশুকিশোর রচনার ঢং, বক্তব্য ও চিন্তা-চেতনায় তিনি নিয়ে আসেন নতুন ব্যঞ্জনা। 'ছুটির দিনদুপুরে', 'পাখিরা ফিরে আসে' এ দু'টি বাংলা শিশু সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া শিশুকিশোরদের জন্য লেখা তাঁর অন্য গ্রন্থগুলি হলো 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'রেলগাড়ি ঝমাঝম', 'রাণীখালের সাঁকো', 'জোৎস্না রাতের গল্প', 'ছোট মামা দি গ্রেট' ইত্যাদি।

সাহিত্য সাধনায় স্বীকৃতি স্বরূপ আহসান হাবীব ১৯৬১ সালে ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার ও একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। আদমজী পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৬৪ সালে, ১৯৭৭ সালে অর্জন করেন নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, ১৯৭৮ সালে লাভ করেন একুশে পদক এবং আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৮০ সালে।

পিরোজপুর থেকে রাজধানী কলকাতা। আবার সেখান থেকে রাজধানী ঢাকা আসেন আহসান হাবীব উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। এখানে এসেও চাকরি নেন 'দৈনিক আজাদ' ও 'মাসিক মোহাম্মদী'-তে। পরে 'দৈনিক ইত্তেহাদ', 'সাপ্তাহিক প্রবাহে'-ও কাজ করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি 'ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম'-এ উপদেষ্টা হিসেবে চাকরি করেন। এক সময় তিনি নিজে একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সর্বশেষ কাজ করেছেন 'দৈনিক বাংলা'য় (সাবেক 'দৈনিক পাকিস্তান')। এ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই (১৯৬৪)-এর সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং জীবনের বাকি সময়টা এখানেই কাজ করেছেন তিনি।

দিনটি ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই। এদিনটিতেই ৬৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য এই কবি। ■

লেখক: এহসানুল ইয়াছিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
উর্মি লোহানী

সম্পাদক
মৌরী তানিয়া

প্রকাশক
গুণীজন কর্মসূচি, ডি.নেট

মুদ্রণে
পাথওয়ে

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

ফররুখ আহমদ

পুলিশ ইন্সপেক্টর সৈয়দ হাতেম আলী আই.এ. পাশ করেই চাকরিতে যোগ দেন। খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা ছিল তাঁর কাজের এলাকা। তবে আই.জি. পুলিশ অফিসে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। সৎ মানুষ হিসেবে সুনাম ছিল তাঁর। তিনি মজলিশি ছিলেন এবং 'খান সাহেব' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ১৯২৪ সালে মারা যাবার পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

প্রথম স্ত্রীর ঘরে পর পর তিনটি মেয়ে জন্মের পর ফররুখ আহমদের জন্ম হয়। রমজানের সময় ফররুখের জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর দাদি তাঁকে আদর করে রমজান বলে ডাকতেন। ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিলেন ফররুখ। দীর্ঘজীবী দাদিই তাঁকে লালন পালন করেন। শৈশবে দাদির কাছে ফররুখ শুনতেন পুঁথির কাহিনী, তাজকিরাতুল আউলিয়া এবং কাসাসুল আম্বিয়া। দাদীর অতি আদরের এই নাতিটি ছোটবেলায় ছিলেন খুব দুরন্ত। তবে সেই বয়সের দুরন্ত এই ছেলেটিকেই আবার ভাবুকতা ও উদাসীনতা পেয়ে বসত প্রায়ই। ধু-ধু মাঠে কিংবা মধুমতী নদী তীরে একা একা ঘুরে বেড়াতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। জ্যোৎস্না রাতে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে ডাহুকের ডাক শুনতেন চুপ করে। আর এসবই হয়তো তাঁর মধ্যে কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। যার ফলে তিনি স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখি শুরু করেন এবং এদেশের বিশিষ্ট ও প্রধান সারির কবিদের তালিকায় তাঁর নাম উঠে আসে।

যশোর জেলার মাগুরা থানার মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ জুন ফররুখ আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মার নাম রওশন আখতার। ফররুখ ছিলেন সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তাঁদের পরিবার ছিল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। ১৯৪৩ সালে ফররুখের বাবা ইন্তেকাল করেন। তাঁর দাদিও ঐ বছর মারা যান।

মাঝআইল গ্রামের পাঠশালায় ফররুখ কিছুদিন পড়েছিলেন। ফারসি-জানা এক মহিলা বাড়িতে এসে তাঁকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে মডেল এম.ই. স্কুলে ভর্তি হন তিনি। এরপর কিছুদিন পড়েন বালিগঞ্জ হাই স্কুলে। বালিগঞ্জ হাই স্কুলে কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর শিক্ষক ছিলেন। বালিগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় তিনি দিলকুশা স্ট্রিটে থাকতেন এবং রোজ সন্ধ্যার পর দিলকুশা পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়তে যেতেন। সমবয়সী, পরবর্তীকালের বিখ্যাত কথাশিল্পী আবু রুশদও ঐ লাইব্রেরিতে প্রায় প্রতিদিন যেতেন। কখনো লাইব্রেরিতে বসে, কখনো পার্ক সার্কাস ময়দানের কোনো নিরালা কোনায়, কখনোবা হেঁটে গড়িয়াহাট লেক পর্যন্ত যেতে যেতে তাঁরা দু'জনে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। সেইসময় তিনি নিরালায় দরাজ গলায় আবৃত্তি করতেন শেলি, কীটস, নজরুলের কবিতা।

এর পর ফররুখ ভর্তি হন খুলনা জেলা স্কুলে। এই স্কুলে তাঁর শিক্ষক ছিলেন সাহিত্যিক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশেম। এই স্কুলের ম্যাগাজিনে ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এই স্কুল থেকেই ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন তিনি। কলকাতায় এসে রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে রিপন কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে আই.এ. পাশ করার পর ঐ বছরই কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ.-তে ভর্তি হন। এরপর ১৯৪১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁর অধ্যাপকমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। স্কুল-কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিকার সত্যজিৎ রায়, অভিনেতা ফতেহ লোহানী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তবে যে-কোনো কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত বি.এ. পরীক্ষা দেননি তিনি।

কলকাতায় থাকাকালীন ফররুখ আহমদ অনেকগুলো চাকরি করেছেন। কিন্তু সবগুলিই ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১৯৪৩ সালে আই.জি. প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৫ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে এবং ১৯৪৬ সালে জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে চাকরি করেন তিনি।

তবে এসব কোনো চাকরিই বেশি দিন করেননি তিনি। কারণ শুধুমাত্র 'মোহাম্মদী' ছাড়া অন্যগুলোর কোনটিই তাঁর কবিমনের সঙ্গে খাপ খায়নি। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ফররুখ আহমদ 'মোহাম্মদী'-তে চাকরি নেন। আর লেখক হিসেবে অনেক আগে থেকেই 'মোহাম্মদী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটি কবিতা সেই সময়কার 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' সম্পাদক নিজের নামে ছাপানোর কারণে তিনি ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মোহাম্মদী'র চাকরি ছেড়ে দেন।

ঢাকা বেতারেই ফররুখ আহমদ দীর্ঘদিন চাকরি করেন। ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা বেতারে প্রথমে অনিয়মিত হিসেবে এবং পরে নিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট বা নিজস্ব শিল্পী হিসেবে কাজ করতে থাকেন এবং আমৃত্যু ঢাকা বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে ফররুখ আহমদ দীর্ঘকাল 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা করেছেন। বেতারের প্রয়োজনে অসংখ্য গান, কথিকা, নাটিকা, শিশুতোষ রচনা, গীতিনাট্য, গীতিবিচিত্রা ইত্যাদি লিখেছেন। নিজের ও অন্যদের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। পুঁথি পাঠও করেছেন মাঝে মাঝে। বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ প্রযোজনা করেছেন। বেতারে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি সৈয়দ আলী আহসান, কবি আবুল হোসেন, কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি শামসুর রাহমান, কবি হেমায়েত হোসেন, গীতিকার নাজির আহমদ, কথাশিল্পী আশরাফ-উজ-জামান খান, কথাশিল্পী নাজমুল আলম প্রমুখ।

১৯৩৭ সালে ফররুখ আহমদ প্রথম সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। কারণ এবছরই 'বুলবুল' ও 'মোহাম্মদী'-তে তাঁর প্রথম রচনাবলি প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয়, 'বুলবুল'-এ প্রকাশিত 'রাত্রি' সনেটটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা (শ্রাবণ ১৩৪৪)। এরপর প্রায় এক হাজারেরও বেশী সনেট তিনি রচনা করেছেন।

প্রথম দিকে ফররুখ গল্পও লিখতেন। যেমন 'মৃত বসুধা' (সওগাত, কার্তিক ১৩৪৪), 'যে পুতুল ডলির মা' ('বুলবুল', বৈশাখ ১৩৪৫), 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' ('মোহাম্মদী', কার্তিক ১৩৪৬) ইত্যাদি। এমনকি 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' নামে মৃত্তিকা পত্রিকায় একটি উপন্যাসও শুরু করেছিলেন (শ্রাবণ ১৩৫৩)- কিন্তু তা শেষ করেননি। ফররুখের কথাসাহিত্য বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু অঝোরে কবিতা লিখতে থাকেন তিনি এবং তা নিয়মিত প্রকাশিতও হতে থাকে। সেকালে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়, অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' বার্ষিকীতে; মুসলমান সম্পাদিত 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি পত্রিকায়; 'বাম বলয়ের অরণি', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন।

১৯৪৪ সালে 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হলে 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় তার দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হয়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ফররুখ আহমদ যেমন 'লাশ', 'আউলাদ' প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন, ১৯৪৬ সালে তেমনি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় আর্ত কবি লিখেছিলেন 'বন্ধ' (স্বাধীনতা, ২৩শে নভেম্বর ১৯৪৬), 'নিজের রক্ত' (২৭শে অক্টোবর ১৯৪৬) প্রভৃতি কবিতা। 'নিজের রক্ত' কবিতাটি অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে কবিকন্ঠে প্রচারিত হয়। কলকাতা-জীবনে ফররুখ আহমদের দু'টি মাত্র কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল- 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪) ও 'আজাদ করো পাকিস্তান' (১৯৪৬)। কিন্তু কলকাতা জীবনে রচিত কবিতার সংখ্যা অজস্র।

১৯৪৮ সালে ফররুখ ঢাকায় চলে আসার পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঢাকাই ছিল তাঁর সাহিত্যক্ষেত্র। ১৯৪৮-৭৪ এই প্রায় তিন দশক তিনি অবিরত সাহিত্য চর্চা করেছেন। এই বছরগুলোতে তাঁর চারটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, চারটি শিশুকিশোরতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো পাণ্ডুলিপির পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছেন, যার কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যেও তাঁর দান রয়েছে অসীম।

বিভাগ পরবর্তীকালে তিনি মূলত লিখেছেন 'সওগত', 'আজাদ', 'মোহাম্মদী', 'মাহে-নও', 'দিলরুবা', 'সৈনিক', 'আজ', 'মদিনা', 'তাহজীব' ইত্যাদি পত্রিকায়, অসংখ্য ছোট পত্রিকায় ও সংকলনে। ফররুখ কয়েকটি গদ্য-ও কাব্যনাট্য লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ('সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থভুক্ত), 'তৈমুর' ও 'নৌফেল ও হাতেম' রেডিও-তে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমীর উদযাপিত নাট্য-সপ্তাহে 'নৌফেল ও হাতেম' মঞ্চস্থ হয়েছে।

ফররুখ আহমদ আরেকটি একাঙ্ক কাব্যনাট্য লিখেছিলেন। 'নয়া জিন্দেগী' নামে এটি 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, পুনর্লিখিত হয়ে 'ইবলিস ও বনিআদম' (কাফেলা গ্রন্থভুক্ত) নামে পৃথিবী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকা বেতারে যুক্ত হওয়ায় ফররুখ লেখেন অনেক আধুনিক, দেশ-প্রেমিক, ইসলামি ও উদ্দীপনামূলক গান, গজল, হামদ ও নাত। এর সূচনা হয়েছিল অবশ্য কলকাতাতেই। ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত গান 'আহমদ আবদুল্লাহ' ছদ্মনামে 'কথা' শীর্ষে মাসিক 'মোহাম্মদী'র আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ফররুখের কোনো কোনো গান ও গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে- তবে এখানো তাঁর কোনো গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ফররুখের গানে যাঁরা সুর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আবদুল হালিম চৌধুরী, আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ, সমর দাস, মোশাররফ হোসেন ফরিদ।

১৯৫২'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ফররুখ আহমদকে যথার্থই উদ্দীপ্ত করেছিল। ভাষা বিষয়ে তাঁর সচেতনতা অনেক আগেই দেখা গিয়েছিল। 'উর্দু বনাম বাংলা' নামক ব্যঙ্গকবিতায় ('মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২) ১৯৪৫ সালেই তিনি তীব্র বিদ্রুপ হেনে লিখেছিলেন, 'দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন/বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা'। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত তাঁর 'পকিস্তান' : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যে ('সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪) তিনি দ্বিধাহীন জানিয়েছিলেন :

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে। আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয়, তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।'

ফররুখ আহমদের কবিতা লেখার সূচনা বিভাগপূর্ব কালেই, কলকাতা পর্যায়ে। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, সমাজের সর্বত্র ও রাজনীতিতে যে চতুর ধূর্ত ব্যক্তিদের তিনি দেখেছিলেন, অজস্র ব্যঙ্গকবিতায় তিনি তাদের ছবি ধরে রেখেছেন। এ এক বিশাল আশ্চর্য চরিত্রচিত্রশালা। জীবদ্দশায় তাঁর কোনো ব্যঙ্গকবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তাঁর অনেক ব্যঙ্গকবিতার পঙক্তি সাহিত্যমোদিদের মুখে আজো শোনা যায়, তসবিরনামা, নসিহতনামা, ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য-এর উল্লেখ অনেকেই করেছেন। ব্যঙ্গকবিতা লিখতে পত্রিকায় ফররুখ অনেকগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন-হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, ইয়ারবাজ খান, মুনশী তেলেসমাত, কোরবান বয়াতী, গদাই পেটা হাজারী, আবদুল্লা বয়াতী, জাহেদ আলী ঘরামী, মানিক পীর, শাহ বেয়াড়া বাউল, ঘুঘুবাজ খান, সরফরাজ খান, মোহাম্মদ আবদুল জলিল, আহমদ আবদুল্লা, মাহবুব আবদুল্লা প্রভৃতি। ১৯৫৭ সালে তাঁর ব্যঙ্গকবিতা নিয়ে সরকারি উপর-মহলে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, এমনকি তাঁকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে কিছুদিন, এজন্যে তিনি কয়েকদিন নিজ বাসা ছেড়ে কমলাপুরে মামার বাসায় ছিলেন।

বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যের সন্ধানেই চল্লিশের দশকে পুথিসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন একদল শিক্ষিত লেখক ও কবি। ফররুখ আহমদ পুথিসাহিত্যের পুনর্নিমাণে মনোনিবেশ করেন। একদিক থেকে তিনি একটি ব্যাপক প্রভাবও সৃষ্টি করেন।

১৯৭১ সালের শেষে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ফররুখ আহমদ একান্ত গৃহবাসী হয়ে পড়েন। কিন্তু তখনো নিভৃতে সাহিত্যচর্চা করেছেন। কোরআন-শরিফের পূর্বকৃত তরজমা পরিমার্জনা করেছেন; হামদ্ ও নাত্ লিখেছেন ও প্রাক্তন লেখা পরিমার্জনা করেছেন; গাদ্দাফি প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন; 'নজরে আকিদাত' নামে একটি উর্দু দীর্ঘ কবিতার তরজমা করেছেন ইস্কাটন মসজিদের ইমামের সহযোগিতায়; হিটলারের সঙ্গে সংলাপ- এমন একটি বিষয় নিয়ে পেন্সিলে একটি গদ্যরচনা লিখেছেন; আর লিখেছেন মৃত্যুর দু'মাস আগে অসামান্য একটি সনেট।

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে আপন খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি)-এর সঙ্গে ফররুখের বিবাহ হয়। তৈয়বা খাতুনের বাবার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হুদা। বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন ফররুখ ও তৈয়বা খাতুনের নানা মোহাম্মদ হুরমাতুল্লাহ। তাঁর নিজের বিয়ে উপলক্ষে ফররুখ 'উপহার' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। জ্ঞান থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও নামায কাযা করেননি তিনি। শরীর ভীষণ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিরিশ রোজাই রেখেছেন। তিনি ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে দু'টো পায়জামা, দু'টো পাঞ্জাবি, একটি গেঞ্জি, একটি শেরওয়ানি, এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল, একজোড়া জুতো, শীতের সময় একটি পুলোভার এবং একটি আলোয়ানই যথেষ্ট ছিল তাঁর। নবীজীর সুন্নতকে ভালবাসতেন বলে তিনি কাপড়ে তালি দিয়ে পরতেন।

ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর প্রবক্তা। কাজী নজরুল ইসলামের পর মুসলিম কবি হিসাবে ফররুখ আহমদই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দাবীদার। তিনি ইসলামিক ভাবধারার অনুসারী হলেও তাঁর মতাদর্শ কখনই তাঁর কবিসত্তাকে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে পারেনি।

ফররুখ আহমদ জীবিত অবস্থায় চারটি পুরস্কারে ভূষিত হন। সেগুলি হল- প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (১৯৬০); বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০); 'হাতেম তায়ী' গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬); 'পাখীর বাসা' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬)।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকার ফররুখ আহমদকে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মৃত্যুর পর ফররুখ আহমদকে তিনটি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮০) ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৪)।

১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর, সন্ধেবেলা ঢাকায় ইস্কাটন গার্ডেনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ■

তথ্যসূত্র

ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য, লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রকাশক: সাঈদ বারী, প্রকাশনী: সূচীপত্র, প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

লেখক : মৌরী তানিয়া

গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ৩ | সংখ্যা : ৫ | জানুয়ারি ২০১২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাবা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের চাকুরে। সেইসময় ব্রিটিশ ভারতের কোন সরকারি চাকুরেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের আত্মপক্ষ বলেই বিবেচনা করা হতো। মহকুমা কিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাই যেমন পারতেন না অনায়াসে সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশতে, তেমনি তাঁর ছেলে-মেয়েরাও একটি সুনির্দিষ্ট গন্ডি অতিক্রম করতে পারতেন না। সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সাথে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মেশার কোন সুযোগ ছিল না। সরকারি নীতিমালার দ্বারাই তাঁদের জীবন, আচরণ, কর্মকান্ড ও চলাচলের সীমা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হত। ফলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের সাথে মিশতে পারতেন না। যার কারণে তাঁর জীবন হয়ে পড়ে খুব একাকী ও নিঃসঙ্গ।

আর এই একাকী জীবনের নি:সঙ্গতা ঘোঁচাতে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে বই। বইকেই তিনি পরম বন্ধু মনে করেন এবং বইয়ের সঙ্গেই তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটান। আর এই পরম বন্ধুটির সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি একসময় শুরু করেন লেখালেখি এবং হয়ে ওঠেন এদেশের সুনামধন্য সাহিত্যিক।

১৯২২ সালের ১৫ জুন চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী ষোলশহরের এক মুসলিম পরিবারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাবা-মার পরিবার ছিলো পূর্ব বাংলার উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও অভিজাত পরিবারগুলোর একটি। ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ১৯৩০ সালে ওয়ালীউল্লাহর বয়স যখন ৮ বছর তখন তাঁর মা মারা যান। তাঁর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন।

সরকারি পদস্থ কর্মকর্তার সন্তান হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষাজীবন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাই ওয়ালীউল্লাহ্'র শিক্ষা জীবন কেটেছে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের নানা প্রান্তে। পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর স্কুলের। ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন ওয়ালীউল্লাহ্। ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে ডিসটিংশনসহ বি.এ. পাশ করেন। তখন ওয়ালীউল্লাহ্'র পিতা ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিছুদিন পড়েছেন কৃষ্ণনগর কলেজেও। বি.এ. পাশ করে তিনি কলকাতায় যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. অর্থনীতিতে ভর্তি হন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে তাঁর মামা খান সিরাজুল ইসলামের সহায়তায় ওয়ালীউল্লাহ্ 'কমরেড পাবলিসার্স' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা চালু করেন। সে বৎসরই ইংরেজী দৈনিক 'Statesman' পত্রিকায় সাবএডিটর হিসেবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে পেশাজগতে প্রবেশ করেন। তারপর ১৯৪৭ সালে আগস্টে পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তাসম্পাদক হয়ে ঢাকায় আসেন। তার আগে তাঁর প্রথম কর্মস্থল ছিলো কলকাতা। ১৯৫১ সালে দিল্লীতে পাকিস্তানি মিশনে। ১৯৫২ সালে দিল্লী থেকে বদলি হয়ে চলে যান অস্ট্রেলিয়াতে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দুই বৎসর অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। তারপর আবার ঢাকার আঞ্চলিক তথ্য দপ্তরে। ১৯৫৫ সালে ওয়ালীউল্লাহ্ আবার করাচি তথ্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক রূপে জাকার্তায় প্রেরণ করা হয় তাঁকে। দেড় বছর তিনি সেখানে পরিচালক পদে ছিলেন। দেড় বছর পর তাঁর পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে পাকিস্তান সরকারের দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় ওয়ালীউল্লাহ্‌কে জাকার্তার দূতাবাসে প্রেস এটাচি হিসেবে নিয়োগ দেন।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জাকার্তায়ই ছিলেন। সেখান থেকে পুনরায় করাচি আসেন। সেখানে ১৯৫৯ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ও.এস.ডি. (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) থাকার পর তাঁকে লন্ডনে অস্থায়ীভাবে প্রেস এটাচি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই সময় তাঁর দায়িত্বকাল ছিলো ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত। অক্টোবরেই আবার বদলি হয় তাঁর। এবার চলে যান পশ্চিম জার্মানির বন-এ। সেখানেই পদোন্নতি হয় তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি পোস্টে। সেখানে ফার্স্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদায় ছিলেন ১৯৬১ সালের মার্চ পর্যন্ত। এপ্রিলে চলে আসেন প্যারিসে। সেখানে ১৯৬৭ সালের আগস্টে ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। এই পদে ছিলেন ১৯৭০ সালের শেষ দিন পর্যন্ত। তারপর তাঁর পদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পাকিস্তান সরকার ওয়ালীউল্লাহ্‌কে ইসলামাবাদে বদলির প্রস্তাব করে, কিন্তু রাজি না হওয়ায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চাকরি ছাড়া জীবনযাপন করেন প্যারিসেই।

চাকরি সূত্রে যাওয়া ফ্রান্সেই ফরাসি দূতাবাসের কর্মকর্তা এ্যান মারির সাথে পরিচয় ঘটে ওয়ালীউল্লাহ্‌র। গড়ে উঠে হৃদ্যতাও। বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলেও তিনি কুটনৈতিক হওয়ায় রাষ্ট্র তাঁকে বিদেশী নাগরিক বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। তাই পুনরায় বদলি হতে হয় তাঁকে। করাচিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে এলে এ্যান মারি প্যারিস থেকে চলে আসেন করাচি। সেখানেই ১৯৫৫ সালে তাঁদের বিয়ে হয় ইসলামী ধর্মমতে। এসময় ধর্মান্তরিত হন এ্যান মারি। তাঁর নাম রাখা হয় আজিজা মোসাম্মৎ নাসরিন। তবে ব্যক্তি এ্যান মারি ঐ কাবিন নামা পর্যন্তই মুসলিম ছিলেন। ধর্ম কোন বড় বিষয় হতে পারেনি তাঁদের সংসারে। ব্যক্তিগতভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাই ধর্মান্ধতাকে তিনি ঘৃণা করতেন চরমভাবে। নিজের সংসারের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সাংসারিক জীবনে ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন দুই সন্তানের জনক। প্রথম সন্তান কন্যা- সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্ এবং দ্বিতীয় সন্তান পুত্র- ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্। এ্যান মারি তিবোর মা-বাবার প্রকৃত বাড়ি প্যারিসে নয়। তাঁদের বসবাস ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের সীমান্তবর্তী এলাকা গ্রিনোবেল- এ। সেই গ্রিনোবেলের ইউরিয়াজ নামক গ্রামেই ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো তিনি ভাল ছবি আঁকতেন। সাহিত্যের প্রতি যেমন তিনি শৈশব থেকে আগ্রহী ছিলেন, তেমনি স্কুলে পড়ার সময় থেকে ছবি আঁকা বা চিত্রশিল্পের দিকেও আগ্রহী ছিলেন। অল্প বয়সেই সাহিত্যিক খ্যাতি না পেলে হয়তো তিনি চিত্রশিল্পীই হতেন। চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ থেকেই পরবর্তীকালে চিত্র সমালোচনাও করেছেন 'স্টেটসম্যান'-এ। ওয়ালীউল্লাহ্ বেশ কিছু ছবিও এঁকেছেন। কিন্তু বিভিন্নজনের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে তাঁর ছবির কোন প্রদর্শনী হয়নি। চিত্রশিল্পী হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্'র সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ নিজেই এঁকেছেন।

শৈশব থেকে শুরু করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে তাঁর বড়ো মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সান্নিধ্যে। তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরুর প্রেরণা তিনি এই মামার কাছ থেকে পেয়েছেন। সিরাজুল ইসলাম ছিলেন একাধারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী ও আইনবিদ; আর চাকরিজীবনে তিনি ছিলেন আইনসচিব। তাঁর স্ত্রী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বড়ো মামী রাহাত আরা বেগম ছিলেন একজন খ্যাতিমান উর্দু লেখিকা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তিনি উর্দুতে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্প ছাড়াও 'ডাকঘর' (১৯১২) নাটক অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র-সংস্কৃতি-পরিস্নাত মামাবাড়ির পরিবেশ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল সন্দেহ নেই।

সাহিত্য সাধনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন সিরিয়াস ধরনের একজন লেখক। কোন গল্প বা উপন্যাস লিখেই তিনি প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিতেন না। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' লেখার পর তিনি তা বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন। কেউ বিরূপ সমালোচনা করলে এবং সে সমালোচনা যদি তিনি নিজে মনে করতেন সংগত, সঙ্গে সঙ্গে সে অংশ ছিঁড়ে ফেলতেন। আবার লিখতেন। অর্থাৎ লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্মম্ভর ছিলেন না। অন্যের গঠনমূলক ও সংগত সমালোচনার প্রতি তিনি ছিলেন সহিষ্ণু, শ্রদ্ধাশীল ও নমনীয় এবং প্রয়োজনে নিজের রচনার পাঠ-পরিবর্তনেও দ্বিধা করতেন না।

ঐ সময়কার সেরা প্রকাশনা সংস্থা 'পূর্বাসা' থেকে বের হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৪৫)। পরবর্তীকালে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মামার ও নিজের প্রকাশনা 'কমরেড পাবলিশার্স' থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৮)। নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশ করে দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) ও তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। প্রথম নাটক 'বহিপীর' বের হয় ১৯৬০ সালে। দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গ-ভঙ্গ' প্রকাশ পায় ১৯৬৪ সালে। তৃতীয় ও সর্বশেষ নাটক 'উজানে মৃত্যু' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী থেকে। এছাড়া জনাব কলিমুল্লাহ কর্তৃক 'লালসালু'র উর্দু অনুবাদ 'Lal Shalu' প্রকাশ পায় ১৯৬০ সালে। এ্যান মারি ১৯৬১ সালে 'L' Arbe sans raciness নামে 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ করেন। এবং 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদ 'Tree Without Roots'- প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। উল্লেখ্য 'লালসালু'র জার্মান ও চেক অনুবাদও বের হয়েছে।

শিবনারায়ণ রায়ের মতে প্রথম যুগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে যিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত সবচাইতে মৌলিক ও প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাস বেশ আলোড়িত হওয়ায় তাঁর ছোটগল্পগুলোর কীর্তি তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্পে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন রকমের এক ব্যক্তি হিসেবে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত নয়, বরং অল্প কয়েকটি ছাড়া মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর ছোটগল্পে ব্যক্তি ও সমাজ খুব ঘনিষ্ঠভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর ভাষাও নিজস্ব- চিহ্নিত; কারো থেকে ধার করা নয়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মতোই ব্যক্তির অন্তর্জগতের সমস্যাও উপেক্ষণীয় নয়। ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যক্তির সেই অন্তঃপুরের ছবি আঁকতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও। যদিও অকালমৃত্যুর কারণে তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল নয়, কিন্তু কাজের গুণে তিনি সমগ্র বাংলা ছোটগল্পকে সাহিত্যের একটি বড় বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' একটি অসামান্য গ্রন্থ। দেশ বিদেশে বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিরাট মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে।

যখন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আক্রমণ শুরু হয় তখন তিনি প্যারিস থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ান। নিজের স্বল্প উপার্জন থেকে যখন যেটুকু সম্ভব কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধতহবিলে পাঠাতেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে প্রতিদিন অসংখ্য স্বদেশীর মৃত্যুর সংবাদে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মানসিক উদ্বেগ, উত্তেজনা তীব্ররূপ ধারণ করে; তিনি আক্রান্ত হন হাইপার টেনশন-এ। বেশ কিছুকাল ধরে ডায়াবেটিসের রোগী থাকায় তাঁর আর সুস্থ অবস্থায় ফেরত আসা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর মধ্যরাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ■

পাঠপঞ্জি

১.সৈয়দ আবুল মকসুদ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য
২.সৈয়দ আকরম হোসেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (জীবনী গ্রন্থমালা)
৩.জীনাত ইমতিয়াজ আলী : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম।

লেখক : শাহ ইলিয়াস কমল ও মৌরী তানিয়া